Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-III, January 2019, Page No. 125-138
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

''রাজা'' নাটকের গান: প্রয়োগের তাৎপর্য

কৃষ্ণপ্রসাদ চ্যাটার্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

Abstract

The symbolic allegorical plays of Rabindranath Tagore are quite different and innovative in their category in the history of Bengali drama. Tagore composed these plays in an unique structure setting aside that of the plays in vogue. Replete with subjective innovations along with many other characteristics, they are different from the traditional Bengali plays in the use of songs. These songs have been used purposively in the allegorical symbolic plays of Tagore. In that sense the songs used in these plays are subject to individual discussion. The subject matter of the present discussion is not all the songs used in the symbolic allegorical plays of Tagore, but the songs used in the play RAJA by him. The songs used in this play have also served many purposes like other plays of Tagore. Therefore the songs in RAJA have been taken into consideration by us to discuss their meaningfulness and implications.

Keyword: ''RAJA'', symbolic allegorical plays, Rabindranath Tagore, songs, meaningfulness.

বাংলা নাটকের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটকগুলি অভিনব সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত নাটকের গঠন উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে রচনা করেছেন রূপক সাংকেতিক নাটকগুলি। যাতে বিষয়গত অভিনবত্ব যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি আরো নানা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। সেক্ষেত্রে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য নাটকগুলিকে অন্য বাংলা নাটক থেকে পৃথক করেছে তার মধ্যে গানের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গানগুলির মধ্য দিয়ে নাটকগুলির অনেক উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয়েছে। সেই সূত্রে রূপক সাংকেতিক নাটকগুলিতে প্রযুক্ত গানগুলি স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। এখানে আমরা সব রূপক সাংকেতিক নাটকের গান নিয়ে আলোচনা করব না। কেবল ''রাজা'' নাটকের গানগুলিই আমাদের আলোচ্য। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের মত ''রাজা'' নাটকে প্রযুক্ত গানগুলিও নাটকটির নানা প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। তাই ''রাজা'' নাটকের গানগুলিকেই আমরা আলোচনার জন্য নির্বাচন করেছি। সেক্ষেত্রে ''রাজা'' নাটকে প্রযুক্ত নির্বাচিত গানের তাৎপর্য অনুসন্ধান করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

আমরা বর্তমান আলোচনায় ''রাজা'' নাটকের গানগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছি। মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে এখানে আমাদের আলোচনার পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু কথা বলা হল। বর্তমান প্রসঙ্গে ''রাজা'' নাটকের চূড়ান্ত পাঠের গানগুলিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আলোচনায় চূড়ান্ত পাঠের গানগুলির একের পর এক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে গানগুলির আলোচনায় চূড়ান্তপাঠের পাশাপাশি কয়েকটি গানের ক্ষেত্রে নাটকটির প্রথম সংস্করণের কথাও এসেছে। তাই এখানে ''রাজা'' নাটকের প্রথম সংস্করণ ও চূড়ান্তপাঠের প্রকাশ তথ্য দেওয়া যেতে

পারে। ''রাজা'' নাটকের প্রথম প্রকাশ ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে। এরপর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে নাটকটি আরেকবার প্রকাশিত হয়। যা স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত ''রাজা''-র দ্বিতীয় সংস্করণ, একইসঙ্গে রবীন্দ্রজীবৎকালের শেষ সংস্করণও। বর্তমান প্রসঙ্গে ''রাজা'' নাটকের চূড়ান্ত পাঠ হিসেবে ১৯২১-এ প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠকেই নেওয়া হয়েছে।

বর্তমান প্রসঙ্গে ''রাজা'' নাটকের গানগুলিকে ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রথমে চূড়ান্ত পাঠের গানটির উল্লেখ করে তারপরে গানটির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে গানের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু কথা বলা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছু কথা প্রণিধানযোগ্য:

> *"গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহনমাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো- বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে।"*[১]

এই কথাগুলিতে গানের গুরুত্ব উঠে এসেছে। গান বিশেষ করে নাটকে গান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কথার মধ্য দিয়ে যা বলা যায় না তা গানের মধ্য দিয়ে বলা যায়। আবার নাটকে এমন কিছু মুহূর্ত আসে যেখানে গানই হয়ে ওঠে ভাব প্রকাশের বলিষ্ঠ মাধ্যম। এই কথা স্মরণে রেখে ''রাজা'' নাটকের গানগুলি কতখানি নাটকীয় উদ্দেশ্য প্রকাশে সার্থক হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখানো হল।

''রাজা'' নাটকের মূল কাহিনি বৌদ্ধ অবদান সাহিত্যের কুশজাতক থেকে গৃহীত হয়েছে। যাতে মল্লরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশ কীভাবে নানারূপ ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রানী প্রভাবতীর সঙ্গে মিলিত হল তা দেখানো হয়েছে।[২] এই কাহিনিই কিছু পরিমার্জনসহ ''রাজা'' নাটকে গৃহীত হয়েছে। সমগ্র নাটকটি প্রমথনাথ বিশীর ভাষায়: 'মানব হৃদয়ের ভগবৎ উপলব্ধির ইতিহাস।'[৩] সেক্ষেত্রে ''রাজা'' নাটকে রানী সুদর্শনার রূপতৃষ্ণা যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি সুদর্শনা কীভাবে শেষে রাজার প্রকৃত পরিচয় লাভ করল এবং রাজার সঙ্গে মিলিত হল তা অপূর্ব কৌশলে দেখানো হয়েছে। এই কাহিনি স্মরণে রেখে ''রাজা'' নাটকের গানের আলোচনা করা যেতে পারে। নাটকটিতে অনেক গান আছে। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন দৃশ্যে অনেক গান সন্নিবেশ করে নাটকীয় বিষয়কে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে সেই গানগুলি ১, ২, ৩-এইরকম সংখ্যায় চিহ্নিত করে একের পর এক ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ করা হল:

১.

''রাজা'' নাটকের প্রথম গান "খোলো খোলো দ্বার রাখিয়ো না আর /বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে"।[৪] এই গানটি বাইরে গীত হয়েছে। তাই গানটির শীর্ষে লেখা আছে 'বাহিরে গান'। কয়েকটি দিক থেকে গানটি গুরুত্বপূর্ণ। গানটির প্রথমেই 'দ্বার' খোলার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। এই আবেদন রাজাই করেছেন। রাজা দ্বারে এসেছেন। তাই সুদর্শনাকে দ্বার খোলার জন্য অনুরোধ করেছেন। রাজার আকুতির দিক থেকে গানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে গানটির 'বাহিরে রেখো না দাঁড়ায়ে' কথাগুলি লক্ষণীয়। যাতে রাজা সুদর্শনাকে ভিতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। এখানে গানটিতে রাজার আসার সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে গানে আছে:

কাজ হয়ে গেছে সারা,
উঠেছে সন্ধ্যাতারা,
আলোকের খেয়া হ'য়ে গেল দেয়া
অস্তসাগর পারায়ে।।[৫]

সন্ধ্যার অন্ধকারে রাজা এসেছেন রানীর দুয়ারে। তাই অন্ধকারের মধ্য দিয়েই রানী রাজাকে বরণ করুক এমন ইচ্ছাই রাজা ব্যক্ত করেছেন গানটিতে। রাজার এই ইচ্ছা নাটকটির ভাবের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রানী

সুদর্শনা সর্বদাই রাজাকে বাইরের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চেয়েছে। তাই এখানে রাজা অন্ধকারের মধ্যে এসে রানীকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, রানী রাজাকে অন্ধকার তথা অন্তরের উপলব্ধি থেকে বরণ করুক। সুতরাং এখানে আলোচ্য গানটিতে রাজা নিজেকে দেখার প্রকৃত উপায় হিসেবে অন্তর্দৃষ্টিকেই ইঙ্গিত করেছেন। এই দিক থেকে গানটি গুরুত্বপূর্ণ। সবমিলিয়ে গানটিতে রানী 'আন্তরিক প্রণোদনায় এগিয়ে এসে' রাজাকে বরণ করুক রাজার এই আকুতিই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে।[৬] যা নাটকটির মূল ভাবকেও ব্যঞ্জিত করেছে।

২.

"রাজা" নাটকের দ্বিতীয় গান সুরঙ্গমার কণ্ঠে গীত হয়েছে। গানটির প্রথম লাইন 'এ যে মোর আবরণ'।[৭] এই গানটি সুরঙ্গমার চরিত্রকে প্রকাশ করেছে। সুদর্শনা যখন রাজার আবির্ভাবে সুরঙ্গমাকে দরজা খুলতে বলেছে তখন তারপরে সুরঙ্গমার "তোমার দুয়োর কে বন্ধ রাখতে পারে রাজা?..." [৮] ইত্যাদি সংলাপের পরেই আলোচ্য গানটি সুরঙ্গমার কণ্ঠে গীত হয়েছে। গানটির প্রথমেই সুরঙ্গমা নিজের আবরণের কথা বলেছে। এবং সেই আবরণ যে রাজার মনের ইচ্ছাতে ছিন্ন হবে এমন কথাও প্রকাশ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে গানটির

'নিশ্বাস বায়ে উড়ে চলে যায়
তুমি কর যদি মন।[৯]

লাইনগুলিই তার প্রমাণ। গানটিতে সুরঙ্গমা সমর্পণের কথাও বলেছে। এ প্রসঙ্গে গানটির কিছু লাইন:

'ঘুম টুটে যাক্ চলে'
চিনি যেন প্রভু বলে;
ছুটে এসে দ্বারে করি আপনারে
চরণে সমর্পণ।।[১০]

এখানে উপরের লাইনে 'ঘুম' শব্দের প্রয়োগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে ঘুম শব্দটি 'অচেতনতা, অপরিচয়ের অজ্ঞতা, আত্মাভিমানের আবরণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।'[১১] সুরঙ্গমা চেয়েছে সমস্ত অবচেতনার অবসান। সমস্ত আবরণ ঘুচে যাক। তবেই রাজার স্বরূপ বোঝা যাবে। এখানে আভাসে সুদর্শনার মনের অবচেতনার কথাও বলা হয়েছে। সুরঙ্গমা তার মনেরও উদ্বোধন কামনা করেছে। সব আবরণ ঘুচলেই রাজার কাছে সমর্পণ করা সম্ভব হবে। নাটকের শেষে দেখা যায় রানী সুদর্শনার মনের জাগরণ ঘটে। যাতে সুদর্শনা রাজার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। রাজার প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারে। এখানে গানটি একদিকে সুরঙ্গমা একইসঙ্গে আভাসে সুদর্শনার চরিত্র প্রকাশেও সহায়ক হয়েছে।

৩.

"রাজা" নাটকের প্রথম দৃশ্যের শেষে সুরঙ্গমার কণ্ঠে একটি গান গীত হয়েছে। গানটির প্রথম লাইন: 'কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায়'। [১২] সমগ্র গানটিতে সুদর্শনার স্বরূপ উঠে এসেছে। সুদর্শনা সর্বদা রাজাকে বাইরে দেখতে চায়। সে রাজাকে বহির্দৃষ্টি দিয়ে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়। একইসঙ্গে সে রাজাকে আলোতেও দেখতে চায়। কিন্তু বাইরের দৃষ্টিতে রাজাকে দেখার চেষ্টা ব্যর্থ। এজন্য সুদর্শনার চেষ্টাও বারে বারে ব্যর্থ হয়। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলেই রাজাকে পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে গানে আছে:

"আজি হৃদয় মাঝে যদি গো বাজে প্রেমের বাঁশি
তবে আপনি সেধে আপনা বেঁধে পরে সে ফাঁসি,
তবে ঘুচে গো ত্বরা ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়-

আহা আজি সে আঁখি বনের পাখী বনে পালায়।"১৩

নিজের মধ্যে যদি প্রকৃত প্রেমের উদয় হয় তবে আর রাজাকে পাওয়ার জন্য বাইরে যেতে হবেনা। তিনি নিজেই এসে ধরা দেন। গানটিতে সুদর্শনার চরিত্রের স্বরূপটি খুব সুন্দরভাবেই উঠে এসেছে। সুদর্শনা রাজাকে বাইরেই পেতে চেয়েছে। গানটিতে সুদর্শনার রূপতৃষ্ণার স্বরূপও উঠে এসেছে। সুরঙ্গমা গানটিতে সুদর্শনার রূপতৃষ্ণাকে 'চপল' বলেছে। [১৪] সবথেকে আশ্চর্য গানটি সুরঙ্গমার চরিত্রকেও ব্যঞ্জিত করেছে। সুরঙ্গমার মধ্যে রাজাকে দেখার সত্য দৃষ্টি আছে। সে রাজাকে চিনতে কখনোই ভুল করেনা। তাই গানটিতে সুরঙ্গমা স্পষ্টভাবে সুদর্শনার চপলতার কথাকে তুলে ধরে। গানটিতে সুরঙ্গমা বারে বারে সুদর্শনাকে সচেতন করে দিয়েছে।

৪.

"রাজা" নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে বালকগণকে নিয়ে ঠাকুর্দার প্রবেশ ঘটে। প্রবেশের পরে ঠাকুর্দা কিছু কথার পরেই একটি গান ধরেন। গানটির প্রথম কয়েকটি লাইন:

"আজি দখিন দুয়ার খোলা-
এসহে, এসহে, এসহে, আমার
বসন্ত এস!"১৫

এই গানটিতে ঠাকুর্দা বসন্তকে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তাই গানটিতে বারে বারে 'বসন্ত এস' কথাগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে ঠাকুর্দা কীভাবে বসন্ত আসবে তারও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। গানটির পূর্বে ঠাকুদার সংলাপে:

"ওরে দক্ষিণে হাওয়ার সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে হবে-হার মানলে চলবে না-আজ সব রাস্তাই গানে ভাসিয়ে দিয়ে চলব।"১৬

এই কথাগুলি লক্ষণীয়। যাতে ঠাকুর্দার আনন্দপূর্ণ তথা মুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই বারে বারে ঠাকুর্দা বসন্তকে আহ্বান করেছেন। এর মধ্য দিয়ে আসলে ঠাকুর্দা বসন্তের আগমনে নতুনভাবে জেগে উঠতে চেয়েছেন। একইসঙ্গে অন্যান্য সকলকেও জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সেই সূত্রে গানটি ঠাকুর্দার স্বভাব বৈশিষ্ট্যকেও একটু প্রকাশ করেছে।

৫.

নাটকটির দ্বিতীয় দৃশ্যেই একদল লোক ঠাকুর্দাকে নিয়ে টানাটানি করে প্রবেশ করে। যাতে প্রথমেই একজন ঠাকুর্দাকে "তোমাকে আজ এমন করে'সাজালে কে?..." [১৭] এই কথা জিজ্ঞাসা করে। এর কিছু পরেই তৃতীয় লোক ঠাকুর্দাকে নিয়ে একটি গানের উল্লেখ করে। গানটি ঠাকুর্দাকে নিয়ে বেঁধেছেন কবি-কেশরী। এখানে গানটির কিছুটা উৎকলিত হল:

"যেখানে রূপের প্রভা নয়নলোভা,
সেখানে তোমার মতন ভোলা কে! (ঠাকুরদাদা)
যেখানে রসিক সভা পরম শোভা
সেখানে এমন রসের ঝোলা কে!(ঠাকুরদাদা)"১৮

এই গানটি ঠাকুর্দার চরিত্রকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে। ঠাকুর্দা সর্বদা মুক্ত মনের পুরুষ। তাই তিনি সর্বত্র আনন্দ নিয়ে বিরাজ করেন। যেখানে সকলে 'গলাগলি কোলাকুলি'করেন সেখানেই ঠাকুর্দার উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ

করা যায়। সবমিলিয়ে গানটিতে ঠাকুর্দার চরিত্রটি বেশ প্রাণবন্তভাবেই উঠে এসেছে। এই দিক থেকে গানটি গুরুত্বপূর্ণ।

৬.

ঠাকুর্দা কবি কেশরীর একটি গানের উল্লেখ করেছেন। যাতে রাজার স্বরূপ উঠে এসেছে। গানটির কয়েকটি লাইন:

"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি স্বত্বে!
(আমরা সবাই রাজা)
...
রাজা সবারে দেন মান
সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো করে'রাখেনি কেউ কোনো অসত্যে ,''[১৯]

গানটির পূর্বে দ্বিতীয় লোক—

"এবার দেশবিদেশের লোক এসেছে, সবাই বলচে সবই দেখচি ভালো কিন্তু রাজা দেখিনে কেন?..." [২০]

এই কথা ঠাকুর্দাকে জিজ্ঞাসা করে। সেই প্রেক্ষিতেই ঠাকুর্দা কিছু কথার পর আলোচ্য গানটির কথা উল্লেখ করেছেন। গানটি নাটকের ক্ষেত্রে উপযোগী হয়েছে। গানটিতে সকলের "আমরা সবাই রাজা"এই ভাবনা যেমন উঠে এসেছে, তেমনি গানটিতে "রাজা সবারে দেন মান"এই কথাগুলিতে রাজার চরিত্রটিও খুব সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। রাজা নিজের রাজ্যে সকলকে সম্মান দিয়েছেন, মর্যাদা দিয়েছেন। তাই গানটির শেষে সকলের মিলিত হওয়ার ভাব ব্যক্ত হয়েছে:

আমরা চলব আপন মতে
শেষে মিলব তাঁরি পথে
মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্ত্তে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি স্বত্বে![২১]

এই কথাগুলিতে সকলে স্বাধীনভাবে চলার কথা জানিয়েছে। আর স্বাধীনভাবে চললেই হবে রাজার সঙ্গে মিলন। এই ভাবটিই গানটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

৭.

''রাজা'' নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে বাউলের দল-এর কণ্ঠে একটি গান গীত হয়েছে। গানটির প্রথম লাইন: "আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে"। [২২] এই গানটির পূর্বে জনার্দন—

"...তোমরা ত এমন রাজ্য জান যেখানে রাজা কেবল চোখেই দেখা যায় কিন্তু রাজ্যের মধ্যে তা'র কোনো পরিচয় নেই, সেখানে কেবল ভূতের কীর্ত্তন-কিন্তু এখানে দেখ-" [২৩]

এই কথাগুলি বলেছে। যাতে রাজার পরিচয় ভালোভাবে না পাওয়ার জন্য জনার্দনের একটা ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। ভবদত্ত জনার্দনের কথার উত্তর দিয়েছে। ভবদত্তর কথার পরেই বাউলের দল আলোচ্য গানটি গেয়েছে। যাতে দেখার প্রকৃত উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে। নাটকটির মধ্যে রানী সুদর্শনা ও আরো কিছু জনতা রাজাকে চোখে

দেখতে চেয়েছে। এবং এই নিয়েই বারে বারে তারা রাজাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। আলোচ্য গানটিতে তাই বাউলের দল রাজার স্বরূপকেই তুলে ধরেছে। রাজাকে দেখতে গেলে ভিতরের দৃষ্টি প্রয়োজন, আমাদের ভিতরেই আছে রাজা। তাই রাজাকে গানটিতে “প্রাণের মানুষ”বলা হয়েছে। যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। এ প্রসঙ্গে গানে আছে:

আছে সে নয়ন-তারায় আলোক-ধারায়, তাই না হারায়,
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে।।
আমি তা’র মুখের কথা
শুনব বলে’গেলাম কোথা,
শোনা হ’ল না, শোনা হ’ল না,[২৪]

রাজাকে দেখার জন্য কোথাও যাবার দরকার নেই। তাই গানটিতে হৃদয় তথা অনুভব দিয়ে রাজার উপস্থিতি অনুভব করার কথা বলা হয়েছে। সবমিলিয়ে গানটি রাজার স্বরূপ উদঘাটনে সহায়ক হয়েছে।

৮.

“রাজা” নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে পাগলের কণ্ঠে একটি গান গীত হয়েছে। গানটির প্রথম কয়েকটি লাইন উৎকলিত হল:

তোরা যে যা বলিস্ ভাই
আমার সোনার হরিণ চাই।
সেই মনোহরণ চপল চরণ
সোনার হরিণ চাই।।
সে যে চমকে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়
যায় না তা’রে বাঁধা,[২৫]

এই গানটিতে ‘সোনার হরিণ’-এর রূপকে রূপতৃষ্ণার কথা বলা হয়েছে। নাটকে সুদর্শনাসহ আরো কয়েকজন রাজাকে সর্বদা বাইরের রূপে দেখার বাসনা প্রকাশ করেছে। তাই গানটিতে সোনার মৃগ প্রসঙ্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সোনার হরিণের প্রসঙ্গ রামায়ণে আছে। যাতে দেখা যায় রাম সোনার হরিণ ধরতে গিয়ে সীতাকে হারিয়েছিলেন। রাম যে সময় হরিণ শিকার করতে গিয়েছিলেন, ঠিক সেই সময়েই রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যায়। অর্থাৎ সোনার হরিণ সর্বদা আমাদের মায়াতে ভুলিয়ে দেয়। এখানে তাই সকলকেই মায়া থেকে দূরে থাকার জন্য আভাসে সচেতন করা হয়েছে।

৯.

নাটকটির তৃতীয় দৃশ্যে সকলের কণ্ঠে একটি গান গীত হয়েছে। গানটির প্রথম লাইন “মোদের কিছু নাই রে নাই,”।[২৬] গানটির পূর্বে ঠাকুর্দা সকলকে “না ভাই, আজ আমার এইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলা। সকলের চলাচলেই আমার মন ছুটচে।...” [২৭] এই কথাগুলি বলেছেন। তার পরেই সকলে মিলে আলোচ্য গানটি ধরেছে। গানটিতে সকলে নিজেদের স্বরূপ তুলে ধরেছে। একইসঙ্গে যারা রাজাকে বাইরের দৃষ্টিতে দেখতে চায় তাদের সম্পর্কেও কিছু কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গানটির কিছু লাইন:

“যারা সোনার চোরাবালির পরে
পাকা ঘরের ভিত্তি গড়ে
তাদের সামনে মোরা গান গেয়ে যাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।”[২৮]

এখানে গানটিতে ‘সোনার চোরাবালি’-র অনুষঙ্গ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যার মধ্য দিয়ে যারা রাজাকে সর্বদা চোখ দিয়ে দেখতে চায় তাদের ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুদর্শনা ও অন্যান্য কিছু লোক রাজাকে নিজের চোখ দিয়ে দেখার বাসনা বারে বারে প্রকাশ করে। কিন্তু প্রকৃত যিনি রাজা তথা চরাচরের রাজা তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তাঁকে দেখার জন্য কোথাও যেতে হবে না। তিনি আমাদের সকলের মধ্যেই আছেন। তাই তাঁকে দেখতে গেলে কেবল উপলব্ধির প্রয়োজন, অনুভূতির প্রয়োজন। তাই আলোচ্য গানের সোনার বালির অনুষঙ্গে বাইরে রাজাকে দেখতে চাওয়া ব্যক্তিদের স্বরূপকেই বোঝানো হয়েছে। এবং তাদের জাগানোর প্রয়াসও গানটিতে লক্ষ করা যায়। গানের ‘মোরা গান গেয়ে যাই’কথাগুলি লক্ষণীয়। যার মধ্য দিয়ে সকলকে সচতেন করার ইঙ্গিত আছে।

১০.

তৃতীয় দৃশ্যের শেষে ঠাকুর্দা “আজ আমাদের নানা সুরের উৎসব-সব সুরই ঠিক একতানে মিলবে।”[২৯] কথাগুলির পর একটি গান ধরেন। এখানে গানটির কিছু লাইন উৎকলিত হল:

“বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে?
দেখিসনে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে!
যে ঢেউ ওঠে তারি সুরে
বাজে কি গান সাগর জুড়ে?
যে ঢেউ পড়ে তাহারো সুর জাগচে সারা বেলা রে।
বসন্তে আজ দেখরে তোরা ঝরা ফুলের খেলা রে।”[৩০]

এই গানটির পূর্বে নাগরিক দল রাজার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এমনকি দ্বিতীয় নাগরিক নিজের ছেলের মৃত্যু প্রসঙ্গেও রাজার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে। প্রথম ও দ্বিতীয় নাগরিক নিজেদের খারাপ দশারও কথা বলে। ঠাকুর্দাও “আমার দশাটাই দেখ না।”[৩১] এই কথা বলেন। তার কিছু পরেই আলোচ্য গানটি ধরেন। যাতে বসন্তের অনুষঙ্গে রাজার স্বরূপ সম্পর্কে কিছু তথ্য উঠে আসে। এ প্রসঙ্গে গানটির আরো কিছু লাইন:

“আমার প্রভুর পায়ের তলে,
শুধুই কিরে মাণিক জ্বলে?
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা রে।”[৩২]

এখানে রাজার স্বরূপ ফুটে উঠেছে। রাজা তথা যিনি সর্বশক্তিমান তিনি সকলের জন্যই। তাই সকলের কাছেই তাঁর সমান আদর। গানটির ‘মাটির ঢেলা’ কথাগুলি খুবই লক্ষণীয়। যার মধ্য দিয়ে রাজার সঙ্গে সকলের যোগের কথা বলা হয়েছে। এভাবেই গানটি রাজার স্বরূপ বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করেছে।

১১.

নাটকের চতুর্থ দৃশ্যে সুদর্শনা নিজের হয়ে বালকদের একটি গান গাইতে বলে। সেই প্রেক্ষিতেই বালকদের কণ্ঠে "বিরহ মধুর হল আজি/মধুরাতে।"৩৩ গানটি গীত হয়। যাতে রানীর কথা কিছু উঠে এসেছে। গানটির কিছু কথা খুবই লক্ষণীয়। যথা:

"অধীর অদর্শন-তৃষা
কি করুণ মরীচিকা আনে
আঁখি-পাতে!"৩৪

এখানে 'অধীর অদর্শন-তৃষা' কথাগুলির মধ্য দিয়ে রানীর চঞ্চলতাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর পূর্বে কিছু কথাতেও রানীর মনের চঞ্চলতা প্রকাশ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে রানীর কিছু কথা:

> *"...আমি কেমন আপনার দিকে চেয়ে আপনি লজ্জা পাচ্চি! ভয় লজ্জা সুখ দুঃখ সব মিলে আমার বুকের মধ্যে আজ নৃত্য করচে।"৩৫*

এখানে কথাগুলিতে যে চঞ্চলতা প্রকাশিত হয়েছে গানটিতে সেই চঞ্চলতা আরেকভাবে উঠে এসেছে। এই দিক থেকে গানটি রানীর চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করেছে।

১২.

আলোচ্য নাটকের পঞ্চম দৃশ্যে সুরঙ্গমার কণ্ঠে একটি গান গীত হয়েছে। যাতে রাজার অধিষ্ঠান সম্পর্কে কিছু কথা উঠে এসেছে। প্রথমেই পুরো গানটি উৎকলিত হল:

"পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে
কোন্ নিভৃতে রে কোন্ গহনে!
মাতিল আকুল দক্ষিণ বায়ু
সৌরভ চঞ্চল সঞ্চরণে
কোন্ নিভৃতে রে কোন্ গহনে।।
কাটিল ক্লান্ত বসন্ত নিশা
বাহির অঙ্গন-সঙ্গী সনে।
উৎসবরাজকোথায় বিরাজে
কে ল'য়ে যাবে সে ভবনে-
কোন্ নিভৃতে রে কোন্ গহনে।।৩৬

গানটির পূর্বে ঠাকুর্দা 'দুর্গমের খবর' পাওয়ার জন্য সুরঙ্গমাকে অনুরোধ করেছেন। তার পরে সুরঙ্গমা ঠাকুর্দাকে 'তোমার নাকি কোনো খবর পেতে বাকি আছে?'৩৭ এই কথা বলেছে। কথাগুলির কিছু পরেই আলোচ্য গানটি গীত হয়েছে। গানটিতে প্রথমেই ফুল এবং বায়ুর অনুষঙ্গ এসেছে। তার পরে এসেছে 'নিশার'প্রসঙ্গ। শেষে এসেছে উৎসবরাজের বিরাজ সম্পর্কিত কিছু কথা। যাতে আসলে রাজার অধিষ্ঠান সম্পর্কেই বলা হয়েছে। এখানে রাজার কাছে যাওয়ার জন্য সুরঙ্গমার ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে।

১৩.

নাটকটির অষ্টম দৃশ্যে রাজার কণ্ঠে প্রযুক্ত গানটি খুবই উল্লেখযোগ্য। গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় এখানে পুরো গানটি উৎকলিত হল:

"আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।
ভরাব না ভূষণ ভারে
সাজাব না ফুলের হারে
সোহাগ আমার মালা করে'
গলায় তোমার পরাব।
জানবে না কেউ কোন্ তুফানে
তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে,
চাঁদের মত অলখ টানে
জোয়ারে ঢেউ তোলাব।।"[৩৮]

এই গানটি নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণেই প্রথম সংযোজিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণ ''রাজা'' নাটকে আলোচ্য গানটি পাওয়া যায় না।[৩৯] গানটির সংযোজন খুবই প্রাসঙ্গিক। বিশ্লেষণ করলেই তা বোঝা যাবে। গানটির পূর্বে রাজা ও রানীর কথোপকথন হয়েছে। যাতে রানী 'সর্বনাশের মধ্যে'রাজাকে দেখার কথা জানিয়েছে। একইসঙ্গে রাজাকে দেখা প্রসঙ্গে 'ভয়ানক'কথাটিও প্রয়োগ করেছে। কিন্তু রানী সর্বনাশের মধ্যে রাজাকে দেখতে আগ্রহী নয়। তাই রানী সুদর্শনা যথার্থভাবে রাজার পরিচয় পেতে চেয়েছে। এজন্য রানী ব্যাকুলও হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রানীর একটি সংলাপের কিছু কথা:

"...এখন আর যে তোমার সঙ্গে তেমন করে' পরিচয় হ'তে পারবে তা মনে করতেও পারিনে।"[৪০]

এই কথাগুলিতে রানী রাজার 'তেমন করে'পরিচয়'পাওয়া যাবে কীনা এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে। যাতে কিছু কথার পরেই রাজার কণ্ঠে আলোচ্য গানটি গীত হয়েছে। গানটিতে রাজার স্বরূপ খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। গানটির 'ভালোবাসায় ভোলাব' কথাগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রাজা কাউকে রূপে ভোলাতে চান না। কারণ রাজা অরূপ। তাই রাজা রানীর চিত্তে ভালোবাসার সঞ্চার ঘটাতে চেয়েছেন। ভালোবাসার সঞ্চার হলেই রানী ভালোভাবে রাজাকে বুঝতে পারবে। এটাই রাজার অভিপ্রায়। আসলে রাজা এখানে রানীর মনে আশার সঞ্চারও করতে চেয়েছেন। শেষে রাজা যে রানীকে দেখা দেবেন এখানে গানটিতে রাজা তারই পূর্বাভাস দিয়েছেন। শেষে দেখা যায় রানী সুদর্শনা রাজাকে বুঝতে পারে। এবং রাজা রানীর মিলনে নাটকের সমাপ্তি ঘটে। সুতরাং গানটি নাটকের পরিণামী ব্যঞ্জনার আভাস দিয়েছে। এই দিক থেকে গানটি গুরুত্বপূর্ণ।

১৪.

''রাজা'' নাটকের প্রথম সংস্করণের অষ্টম দৃশ্যে একটি গানের প্রথম লাইন: 'আমারে তুমি কিসের ছলে'।[৪১] এই গানটি সুরঙ্গমার কণ্ঠে গীত হয়েছিল। কিন্তু নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণে তা বর্জিত হয়েছে। তার পরিবর্তে সংযুক্ত হয়েছে 'ভয়েরে মোর আঘাত কর'।[৪২] গানটি। যা সুরঙ্গমার কণ্ঠেই গীত হয়েছে। গানটিতে সুরঙ্গমা ভয় দূর করার জন্য রাজার কাছেই অনুরোধ জানিয়েছে। আসলে সুরঙ্গমা এখানে নিজের ভয় প্রসঙ্গে সুদর্শনারই ভয় দূর করতে চেয়েছে। কারণ গানটির পূর্বে সুদর্শনা 'ক্রমেই বেগ বেড়ে উঠচে- এবার নোঙর ছিঁড়ল! হয়ত ডুবব কিন্তু আর ফিরব না।''[৪৩] এই কথা বলেছে। যাতে সুদর্শনার ভয়ই প্রকাশ পেয়েছে। এজন্য সুরঙ্গমা গানটিতে জীবনকে মুক্ত পথে উড়িয়ে দেওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছে। এ প্রসঙ্গে গানে আছে:

"এসহে, ওহে আকস্মিক

ঘিরিয়া ফেল সকল দিক্
মুক্ত পথে উড়ায়ে নিক্
নিমেষে এ জীবন।'[৪৪]

গানটিতে সুরঙ্গমা বেশ বলিষ্ঠভাবে সুরঙ্গমার ভয় নিবারণ করতে চেয়েছে। এই দিক থেকে গানটির সংযোজন প্রাসঙ্গিক।

১৫.

নাটকটির অষ্টম দৃশ্যের শেষে সুরঙ্গমার কণ্ঠে একটি গান গীত হয়েছে। এখানে গানটির কয়েকটি লাইন উৎকলিত হল:

"আমি তোমার প্রেমে হব সবার
কলঙ্কভাগী।
আমি সকল দাগে হব দাগী।
তোমার পথের কাঁটা করব চয়ন;
যেথা তোমার ধূলার শয়ন
সেথা আঁচল পাতব আমার
তোমার রাগে অনুরাগী।"[৪৫]

এই গানটিতেও সুরঙ্গমার চরিত্রটি বেশ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে সুরঙ্গমা পুরোপুরিভাবে সুদর্শনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সে রাজার দাসী। তাই সে সর্বদা সুদর্শনার কাজের ভাগ নিতে চেয়েছে। তাই সুরঙ্গমা নিজেকে সুদর্শনার 'অনুরাগী'বলে অভিহিত করেছে। যার মধ্য দিয়ে সুদর্শনার প্রতি তার দাসীসুলভ মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। এই দিক থেকে গানটি সুরঙ্গমার চরিত্র প্রকাশক।

১৬.

নাটকটির দশম দৃশ্যের শেষে সুরঙ্গমার কণ্ঠে একটি গান গীত হয়েছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় পুরো গানটিই উৎকলিত হল:

আমি কেবল তোমার দাসী।
কেমন করে'আনব মুখে তোমায় ভালবাসি!
গুণ যদি মোর থাকত তবে
অনেক আদর মিলত ভবে,
বিনামূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণ প্রয়াসী।।[৪৬]

এই গানটি প্রথম সংস্করণ "রাজা" নাটকে নেই। দ্বিতীয় সংস্করণেই প্রথম সংযোজিত হয়। গানটির পূর্বে সুদর্শনা সুবর্ণকে রাজা বলে ভুল করেছে। সুরঙ্গমা রানীর ভ্রম দূর করে। তার পরেই সুদর্শনা "...আচ্ছা সত্যি বল্, তুই তোর রাজাকে খুব ভালবাসিস্!"[৪৭] এই কথা সুরঙ্গমাকে জিজ্ঞাসা করে। সেই প্রেক্ষিতেই সুরঙ্গমার আলোচ্য গানটি। যাতে সুরঙ্গমা রানীরই দাসী বলে নিজেকে অভিহিত করেছে। এর মধ্য দিয়ে সুদর্শনার প্রতি সুরঙ্গমার আনুগত্য প্রকাশিত হয়েছে। এই গানটিতেও সুরঙ্গমার চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে।

১৭.

নাটকটির চতুর্দশ দৃশ্যের শেষে সুদর্শনার কণ্ঠে একটি গান গীত হয়েছে। যাতে সুদর্শনার অন্ধকারের প্রতি আসক্তি প্রকাশিত হয়েছে। এখানে গানটির কিছু লাইন উৎকলিত হল:

এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে,
ওহে অন্ধকারের স্বামী!
এস নিবিড়, এস গভীর, এস জীবনপারে
আমার চিত্তে এস নামি।
এ দেহ মন মিলায়ে যাক্ হইয়া যাক্ হারা
ওহে অন্ধকারের স্বামী![৪৮]

এই গানটি সুদর্শনার চরিত্র পরিবর্তনের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুদর্শনা শেষে রাজাকে বরণ করে নেবে। এখানে তারই যেন পূর্বাভাস ফুটে উঠেছে। তাই সুদর্শনা গানটিতে অন্ধকারের প্রতি নিজের অনুরাগ প্রকাশ করেছে। একইসঙ্গে রাজাকে বারে বারে ‘অন্ধকারের স্বামী’বলে চিনতে পেরেছে।

১৮.

আলোচ্য নাটকের অষ্টাদশ দৃশ্যে ঠাকুর্দা বসন্ত উৎসবের কথা বলতে গিয়ে একটি গান ধরেন। যাকে ঠাকুর্দা ‘ঘা দেবার গানটা’বলে ভূষিত করেছেন। গানটির কিছু লাইন:

“আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে,
কোরো না বিড়ম্বিত তা’রে।
আজি খুলিয়ো হৃদয়-দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো,
এই সঙ্গীত মুখরিত-গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো!”[৪৯]

এই গানটিও প্রথম সংস্করণ “রাজা” নাটকে নেই। দ্বিতীয় সংস্করণেই প্রথম সংযোজিত হয়। গানটিতে বসন্তকে বরণ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে সকলকে একসঙ্গে মিলিত হওয়ারও আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। গানের ‘আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো,’ লাইনটিই তার প্রমাণ। গানটি বসন্ত বন্দনার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

১৯.

নাটকের ঊনবিংশ দৃশ্যে সুদর্শনা রাজার সঙ্গে নিবিড় যোগ অনুভব করেছে। এবং অন্ধকারের মধ্যেও রাজার উপস্থিতি অনুভব করেছে। সেই প্রেক্ষিতে সুরঙ্গমার একটি গানে অন্ধকারের মধ্যে রাজার সঙ্গে মিলনের কথাই উঠে এসেছে। এ প্রসঙ্গে গানটির প্রথম কয়েকটি লাইন:

অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে।
কখন্ তুমি এলে, হে নাথ, মৃদু-চরণপাতে?
ভেবেছিলেম জীবনস্বামী,
তোমায় বুঝি হারাই আমি,
আমায় তুমি হারাবে না বুঝেছি আজ রাতে।[৫০]

এই গানটিও প্রথম সংস্করণ “রাজা” নাটকে নেই। দ্বিতীয় সংস্করণেই প্রথম সংযোজিত হয়। গানটিতে সুরঙ্গমা নিজের কথার মধ্য দিয়ে সুদর্শনার কথাকেই তুলে ধরেছে। সুদর্শনা সর্বদা রূপের মধ্য দিয়ে রাজাকে দেখতে চেয়েছে। কিন্তু ঊনবিংশ দৃশ্যটিতে সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার যে কথা হয়েছে তাতে বোঝা যায় সুদর্শনার রূপ তৃষ্ণা দূর হয়েছে। সে রাজার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাই গানটিতে রাজার চরিত্র খুব সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। গানটিতে রাজার সঙ্গে নিবিড় যোগের কথাও আছে।

২০.

“রাজা” নাটকের শেষ গান সুরঙ্গমার কণ্ঠেই গীত হয়েছে। গানটির প্রথম লাইন: ‘ভোর হ’ল বিভাবরী, পথ হ’ল অবসান!’[৫১] রানী সুদর্শনা সমস্ত অভিমান ভুলে রাজার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছে। যার ফলে শেষে রাজার সঙ্গে রানীর মিলন হয়েছে। শেষ গানটি নাটকের ‘ভাব পরিণামের দ্যোতক’[৫২] হিসেবেই কাজ করেছে। গানটির শেষ লাইন:

‘লজ্জাভয় গেল ঝরি ঘুচিলরে অভিমান।।’[৫৩]

এখানে অভিমান দূরের মধ্য দিয়েই নাটকের পরিণাম প্রকাশ পেয়েছে। তাই নাটকের শেষে রানী সুদর্শনা সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়ে রাজাকে ‘প্রণাম’-এর মধ্য দিয়ে বরণ করে নিয়েছে। এই দিক থেকে গানটি নাটকের পরিণামী ব্যঞ্জনা প্রকাশে সহায়ক হয়েছে।

এইভাবে “রাজা” নাটকে প্রযুক্ত প্রতিটি গানই নাটকের নানা উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়েছে। আমরা নাটকটির চূড়ান্তপাঠের নির্বাচিত গানের বিশ্লেষণ করেছি। আলোচনায় দেখা গেছে নাটকের গানগুলিতে কাহিনির কিছু দিক যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি গানগুলি চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটনেও ভূমিকা নিয়েছে। প্রসঙ্গত আমরা “রাজা” নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত কিছু গানের কথা বলেছি। সেই গানগুলি প্রথম সংস্করণে না থাকায় নাটকীয় বিষয় একটু অসম্পূর্ণ ছিল। এজন্য রবীন্দ্রনাথ নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণে গান সংযোজন করে নাটকের বিষয়কে পূর্ণ করেছেন। যার মধ্য দিয়ে নাটকটি নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয়েছে। সবমিলিয়ে “রাজা” নাটকে প্রযুক্ত প্রতিটি গানেরই প্রয়োগ বেশ প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

তথ্যপঞ্জি:

১. গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী(নবম খণ্ড) বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৭, সুলভ সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪২১, পৃ. ৪৮৭।

২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস(চতুর্থ খণ্ড), সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, সপ্তম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ২১৮।

৩. রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, প্রমথনাথ বিশী, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩, ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ জুলাই ২০১৪, পৃ. ২০০।

৪. রাজা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯২১, পৃ. ৭।(অতঃপর তথ্যপঞ্জিটি ‘রাজা: দ্বিতীয় সংস্করণ’বলে উল্লিখিত হবে)।

৫. তদেব, পৃ. ৮।

৬. রবীন্দ্রনাটকে গানের ভূমিকা, রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ, ডি এম লাইব্রেরি, ৪২ বিধান সরণী, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ: ফাল্গুন ১৩৮৮,পৃ. ৩৪। (অতঃপর তথ্যপঞ্জিটি 'রবীন্দ্রনাটকে গানের ভূমিকা: রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ'বলে উল্লিখিত হবে)।
৭. 'রাজা: দ্বিতীয় সংস্করণ', পৃ. ৮।
৮. তদেব।
৯. তদেব।
১০. তদেব, পৃ. ৯।
১১. 'রবীন্দ্রনাটকে গানের ভূমিকা: রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ', পৃ. ৩৬।
১২. 'রাজা: দ্বিতীয় সংস্করণ', পৃ. ১৫।
১৩. তদেব।
১৪. 'রবীন্দ্রনাটকে গানের ভূমিকা: রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ', পৃ. ৩৮।
১৫. 'রাজা: দ্বিতীয় সংস্করণ', পৃ. ১৯।
১৬. তদেব, পৃ. ১৮।
১৭. তদেব, পৃ. ২২।
১৮. তদেব, পৃ. ২৩।
১৯. তদেব, পৃ. ২৫।
২০. তদেব, পৃ. ২৪।
২১. তদেব, পৃ. ২৫।
২২. তদেব, পৃ. ২৯।
২৩. তদেব, পৃ. ২৮।
২৪. তদেব, পৃ. ২৯।
২৫. তদেব, পৃ. ৩৮।
২৬. তদেব, পৃ. ৪৬।
২৭. তদেব।
২৮. তদেব, পৃ. ৪৭।
২৯. তদেব, পৃ. ৫২।
৩০. তদেব।
৩১. তদেব, পৃ. ৫১।
৩২. তদেব, পৃ. ৫২।
৩৩. তদেব, পৃ. ৫৭।
৩৪. তদেব।
৩৫. তদেব।
৩৬. তদেব, পৃ. ৬৮।
৩৭. তদেব।
৩৮. তদেব, পৃ. ৮১।
৩৯. রাজা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইণ্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯১০, পৃ. ৭৪।(অতঃপর তথ্যপঞ্জিটি 'রাজা: প্রথম সংস্করণ'বলে উল্লিখিত হবে)।
৪০. 'রাজা: দ্বিতীয় সংস্করণ', পৃ. ৮১।

৪১. 'রাজা: প্রথম সংস্করণ' পৃ. ৭৭।
৪২. 'রাজা: দ্বিতীয় সংস্করণ', পৃ. ৮৪।
৪৩. তদেব।
৪৪. তদেব, পৃ. ৮৫।
৪৫. তদেব, পৃ. ৮৭-৮৮।
৪৬. তদেব, পৃ. ৯৫।
৪৭. তদেব।
৪৮. তদেব, পৃ. ১১২-১১৩।
৪৯. তদেব, পৃ. ১৩১।
৫০. তদেব, পৃ. ১৩৪।
৫১. তদেব, পৃ. ১৩৬।
৫২. 'রবীন্দ্রনাটকে গানের ভূমিকা: রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ', পৃ.৭৩।
৫৩. 'রাজা: দ্বিতীয় সংস্করণ', পৃ. ১৩৬।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।
২. অভ্র বসু, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী শান্তিনিতেকন।
৩. অমরনাথ পাণ্ডে, টিচার ইনচার্জ ও অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার, সোনাথলি কালাপাথর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সোনাথলি, কাশিপুর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।